বেঙ্গল টাইমস

দীপাবলি সংখ্যা

নভেম্বর, ২০২১

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

অমরত্বই পেয়ে গেল পান্নালালের শ্যামাসঙ্গীত
❑ দিব্যেন্দু দে

ছেলেবেলার চকোলেট বোম আর রূপকথার সেই ‘বুড়িমা’
❑ সংহিতা বারুই

হুজুগের এমন উর্বর জমি, কে না চাষ করতে চাইবে!
❑ তমাল ভৌমিক

ধনতেরাস নিয়ে বাঙালির এত আদিখ্যেতা কেন?
❑ রুমা ব্যানার্জি

স্পেশাল ফিচার

ছৌ মুখোশের চড়িদা গ্রামে একটি দিন
❑ বুবুন ঘোষাল

ব্যস্ততার মাঝেও চিঠি লিখতে ভুলতেন না
❑ ঋষভ সোম

আহারে–বাহারে

বিভূতিভূষণ এখানে কখনও খেতে আসেননি
❑ দিব্যেন্দু দে

রাজনীতি

রাজীব তো নিমিত্তমাত্র

❑ রক্তিম মিত্র

ভূতের খোঁজে নৈশ অভিযান শিমূলতলায়

❑ সৌম্যদীপ সরকার

বিনোদন

গোল দিয়ে গেল গোলন্দাজ

❑ কুণাল দাশগুপ্ত

পুরনো সিরিয়াল ফেরানো যায় না!

❑ বৃষ্টি চৌধুরি

খেলা

ভারত–পাক সিরিজই পারে সম্প্রীতি ফেরাতে

❑ সোহম সেন

এতখানি উপেক্ষা বোধ হয় কোহলির প্রাপ্য ছিল না

❑ উত্তম জানা

ভ্রমণ

সুন্দরবন নিয়ে এত উদাসীনতা কেন?

❑ সুমিত চক্রবর্তী

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন— ২৪৪৫ ৫৬৫৭

ই-মেল: bengaltimes.in@gmail.com, ওয়েবসাইট: bengalttimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

শুভ দীপাবলি

এবার বর্ষা নিয়ে নিশ্চয় কারও অভিযোগ নেই। কী শহর, কী গ্রাম –ঝেঁপে বৃষ্টি হয়েছে। অনাবৃষ্টি নয়, বরং অতিবৃষ্টি নিয়ে কোথাও কোথাও মানুষ নাজেহাল। শরৎ, হেমন্ত এই ঋতুগুলোও যেন প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। মোটামুটি এগারো মাস গরম কাল। টেনেটুনে এক মাস শীতকাল। এটাই বাংলার সাম্প্রতিক কালের ঋতুচক্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকী রচনার বইয়েও বোধ হয় শরৎকাল, হেমন্তকালের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গিয়েছিল। এবার পরিস্থিতি একটু হলেও অন্যরকম। গরম ছিল ঠিকই, তবে বর্ষা এসে তাকে অনেকটাই প্রশমিত করেছে। শরতের ঝলমলে নীল আকাশে দিব্যি সাদা মেঘের ভেলা ছিল। ভুলতে বসা হেমন্ত যেন একটু একটু করে সুর ছড়িয়েছে। আর শীত! এখনও তেমন কাঁপুনি আসেনি ঠিকই, তবে দীপাবলির আগেই কেমন যেন একটা হিমের পরশ। কবির ভাষায় বলতে হয়, শীত এলে বসন্ত আর কতই বা দূর!

প্রকৃতি যখন নিজেকে মেলে ধরছে, তখন চারপাশের স্তব্ধতা এখনও কাটেনি। কেমন যেন থমথমে আবহ। দ্বিতীয় ঢেউ অতিক্রম করে তৃতীয় ঢেউ কি আসবে? সে কি আগের মতোই ভয়াবহ হবে! আরও কোনও নিকটজনদের হারাতে হবে না তো! এই আশঙ্কাও যেন তাড়া করছে। শীত এলেই বাঙালির মন উড়ু উড়ু। সে আপন খেয়ালে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ে। এবার সেই পর্যটনের ছবিটা কেমন হবে, এখনও পরিষ্কার নয়।

তবু জীবন থেমে থাকে না। সে এগিয়ে চলে নিজের গতিতেই। পুজো সংখ্যার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার হাজির দীপাবলি সংখ্যা। ছাপা হরফের পুজো সংখ্যা এবার ছিল বাড়তি আকর্ষণ। রাজনীতি, খেলা, সাহিত্য, সিনেমা সর্বত্রই নানা ঘটনাপ্রবাহ থাকবে। বিতর্ক থাকবে। সেগুলোকে সীমিত পরিসরে একটু ছুঁয়ে দেখা। পাশাপাশি পুরনো কিছু নস্টালজিয়াকে একটু উস্কে দেওয়া। কিছু পুরনো বিভাগের পাশাপাশি কিছু নতুন বিভাগকেও শামিল করার একটা চেষ্টা। স্বল্প পরিসরে, স্বল্প সময়ে আবার ডানা মেলল বেঙ্গল টাইমস। সেই উড়ানে আপনাদেরও সাদর আমন্ত্রণ।

অমরত্বই পেয়ে গেল পান্নালালের শ্যামাসঙ্গীত

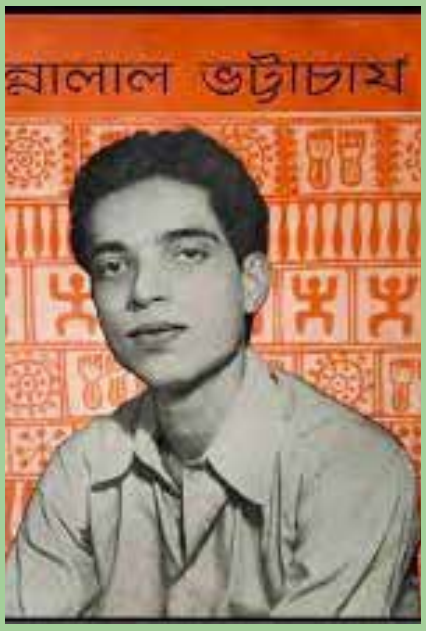

দিব্যেন্দু দে

কালীপুজো এলেই বড় বেশি করে তাঁর কথা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে, বাড়িতে বাড়িতে বেজে ওঠে। কার কথা বলছি ? অনেকেই ধরে ফেলেছেন, পান্নালাল ভট্টাচার্য। আমাদের অনেকেরই বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর গান। আমার জন্ম আটের দশকে। বাড়িতে যে খুব একটা ভক্তির পরিবেশ ছিল, এমনও নয়। নতুন টেপ রেকর্ডার এলে যা হয়! যার যেমন পছন্দ, সে তেমন ক্যাসেট কিনে আনে।

পান্নালাল ভট্টাচার্যের ক্যাসেটটা কে কিনে এনেছিল, আজ আর মনে নেই। হতে পারে ছোট কাকা। আমার কিশোর বয়সে ওই গান ভাল লাগবে কেন? তখন আমি কিশোর শুনছি, হেমন্ত শুনছি, পরের দিকে কুমার শানু শুনছি। পান্নালালকে কিছুটা বেসুরোই মনে হত। যত সময় এগোলো, গানগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গেল। কেন জানি না, গলাটা একটু একটু ভাল লাগতে শুরু করল। আমার সাধ না মিটিল, তুই নাকি মা দয়াময়ী, সকলই তোমারই ইচ্ছা, আমায় দে মা পাগল করে, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে—এই সব গানগুলো নিজের মনেই গুনগুন করতাম।

পরে জানলাম, উনি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাই। আরও পরে জানলাম, মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন। যিনি এমন ভক্তিগীতি গাইতেন, তিনি নিজেকে এভাবে কেন শেষ করে দিলেন ? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। পরে নানা লোকের কাছে একটু একটু করে জেনেছি। আগে দুই ভাইই নাকি শ্যামাসঙ্গীত ও আধুনিক দুটোই গাইতেন। দাদা ধনঞ্জয়ের পরামর্শেই শ্যামাসঙ্গীতকেই বেছে নেন পান্নালাল। দুজনের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়ে গেল। ফিল্ম ছাড়া ধনঞ্জয় শ্যামাসঙ্গীত গাইবেন না। আর পান্নালাল আধুনিক গাইবেন না। এই বোঝাপড়াটা ঠিকঠাকই চলছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর স্নেহে কোনও কার্পণ্যও ছিল না।

কিন্তু একটু নাম-ডাক হলে যা হয়! অনেক রকম বন্ধু জুটে যায়। তাঁরাই কান ভাঙাতে লাগলেন পান্নালালের। বোঝানো হল, তিনি আধুনিক গান গাইলে ধনঞ্জয়ের বাজার থাকবে না। তাই তিনি ভাইকে সরিয়ে দিলেন। অনেকে বলেন, পান্নালাল নাকি সেই সময় এরকম প্রচারে বিশ্বাসও করেছিলেন। ফলে, দুই ভাইয়ের বাক্যালাপই বন্ধ হয়ে গেল। পরে সেই দূরত্ব কিছুটা কমলেও মাঝের সেই ফাটলটা থেকেই গিয়েছিল।

কিছুটা যেন হতাশই হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝেই শ্মশানে চলে যেতেন। নিজের মনেই বিড়বিড় করে কথা বলতেন। বলতেন, এত মা –এর গান গাইলাম, মা দেখা দিচ্ছে না কেন ? বাড়িতে তখন স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে। কিন্তু একটু একটু করে যেন সংসার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ছেন। একদিন নিলেন সেই চরম সিদ্ধান্তটা। কাউকে কিছু না জানিয়েই চিরতরে হারিয়ে গেলেন চেনা জগৎ থেকে।

পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে গেল। অনেক সাধ হয়ত মেটেনি। অনেক আশা পূরণও হয়নি। কিন্তু সব কি ফুরিয়ে গেল ? এখনও প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে তাঁর গান ঠিক বেজে ওঠে। ফুরিয়ে যায়নি। সেই কণ্ঠ হয়ত অমরত্বই পেয়ে গেল।

ছেলেবেলার চকোলেট বোম আর সেই রূপকথার ‘বুড়িমা’

আমাদের অনেকের ছোটবেলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নাম বুড়িমার চকলেট বোম। কে ছিলেন এই ‘বুড়িমা’। কীভাবে গড়ে উঠল তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য? লড়াকু সেই বুড়িমার জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তুলে ধরলেন সংহিতা বারুই।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি বুড়িমার কথা। বাড়ির লোকের কাছে জানতে চাইতাম, কে এই বুড়িমা ? তিনি কোথায় থাকেন? কোনও উত্তর পেতাম না। পুজো এলে প্রশ্নটা ফিরে ফিরে আসত। পুজো পেরিয়ে গেলে প্রশ্নটাও থেমে যেত। আবার পুজো আসত। আবার ভেসে উঠত প্রশ্নটা। এভাবেই আমাদের অনেকের বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ‘বুড়িমার চকলেট বোম’।

বড় হলাম। কিন্তু ছেলেবেলার সেই প্রশ্নটা মাথায় থেকেই গিয়েছিল। কে এই ‘বুড়িমা’? তিনি কোথায় থাকেন? খোঁজ করতে করতে চলেই গেলাম। জানলাম, এক লড়াকু মহিলার দুরন্ত লড়াইয়ের উপাখ্যান। নিছক গল্প বলা ঠাকুমা নন। তাঁর লড়াই অনেকটা রূপকথার মতোই। পুজোর আবহে প্রিয় পাঠকদের কাছে তুলে ধরা যাক সেই লড়াইয়ের উপাখ্যান।

তার আগে বুড়িমার আসল নামটা বলে ফেলা যাক। তাঁর আসল নাম অন্নপূর্ণা দাস। জন্ম, বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতার যে কঠিন লড়াই, তা খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ফরিদপুর থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের ধলদিঘি সরকারি ক্যাম্পে ছিন্ন মূল হয়ে আসা। তারপর ধলদীঘি থেকে হাওড়ার বেলুড়ে আসা। অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা ,অনেক হাহাকার

সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তবু তিনি সাধারণ বাঙালি নারী হয়েও ব্যবসা ক্ষেত্রে একা সাফল্যের ধ্বজা তুলে ধরে-ছিলেন। অন্নপূর্ণা দাস থেকে পরিণত হলেন অবশেষে বুড়িমা তে ।

সালটা ১৯৪৭। ভারতের স্বাধীনতার বছর। কিন্তু এখন যেটা বাংলাদেশ, তখনকার পূর্ব পাকিস্তান, সেখানের অবস্থা নারকীয়। লুঠতরাজ, হত্যা, ধর্ষণে জর্জরিত। সেই সঙ্গে চলছে জবর দখল। দলে দলে মানুষ তখন ভারত-মুখী। চার সন্তানের জননী অন্নপূর্ণা এই পরিস্থিতিতে দিশেহারা। তিন মেয়ে এক ছেলে। বড় আর মেজ মেয়ের সদ্য বিয়ে হয়েছে। ছোটো ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে যে এপার বাংলায় চলে আসবেন, সে উপায়ও নেই। স্বামী সুরেন্দ্রনাথের তেমন সায় ছিল না। তাঁর ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণাও। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ নাগাদ আশপাশের আর দশটা পরিবারের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসালেন অন্নপূর্ণাও।

ভারত অভিমুখে যাত্রা। পশ্চিম দিনাজ পুরের ধলগিরি ক্যাম্প। সঙ্গে ছোট ছোট দুই ছেলেমেয়ে। সুখের সংসার থেকে একেবারে রিফিউজি ক্যাম্পে। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। রোজ ভোরে উঠে সন্তানদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম। কোনও দিন পটল, বেগুন, কুমড়ো , ঝিঙে কিনে বাজারে বিক্রি করা। কখনও বা কর্মকারের কাছ থেকে হাতা, খুন্তি কিনে হাটে বিক্রি

কিংবা বাড়ি বাড়ি নানান সামগ্রী ফেরি। এই ভাবেই চলছিল। গঙ্গারামপুরে এভাবেই একদিন পরিচয় হয়ে গেল সনাতন মণ্ডলের সঙ্গে। তাঁর মুদির দোকান তো ছিলই, তার সঙ্গে তিনি দক্ষ হাতে বিড়িও বাঁধতে পারতেন। অন্নপূর্ণা দেবীকে তিনি মা বলে সম্বোধন করেছিলেন নিজের হারানো মা কে ভুলতে। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠার পর অন্নপূর্ণা দেবী সনাতনের কাছে জানতে চাইলেন বিড়ি বাঁধার কায়দা। মাতৃসমা অন্নপূর্ণা দেবীকে খুব যত্ন করেই বিড়ি বাঁধা শেখালেন সনাতন। ক্রমে ক্রমে অন্নপূর্ণাও হয়ে উঠলেন বিড়ি বাঁধায় দক্ষ। শুধু তাই নয়, বছর তিনেক ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি খুলে ফেললেন একটা বিড়ি তৈরির কারখানা। সেই সঙ্গে গড়ে উঠল একটা নিজের পাকা বাসস্থানও।

তবে সমস্ত সুখ একসঙ্গে হয় না। তাই তালেগোলে একমাত্র ছেলের লেখাপড়া শিকেয় উঠল। তার সঙ্গে আরও একটা বিপর্যয়। অন্নপূর্ণার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পড়তে লাগল সনাতনের ব্যবসা। তিনি গঙ্গারামপুর থেকে চাটিবাটি গুটিয়ে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়িতে। যাওয়ার আগে তিনি অন্নপূর্ণাদেবীর ছোট মেয়ের জন্য একটা পাত্রও ঠিক করে দিয়ে গেলেন। পাত্র বেলুড়ের। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে জামাই বেলুড়ের প্যারীমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে একটা দোকান-সহ বাড়ির সন্ধান দিলেন। দাম মাত্র ন'শো টাকা। আস্তে আস্তে অন্নপূর্ণা দেবী পরিচিত হলেন কলকাতার ব্যাপারী জগতের পীঠস্থান বড়বাজারে সঙ্গে। বিড়ির সঙ্গে চলতে লাগল নানা ধরনের ছোটখাটো জিনিসের ব্যবসা। এখানেও সনাতনের মতো পেয়ে গেলেন হরকুসুম গাঙ্গুলিকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ায় তাঁকে সনাতনের মতো সহজে ছেলে বলে মেনে নিতে দ্বিধায় ছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। তবে বিভেদ ঘুচিয়ে দিলেন হরকুসুমই। একদিন অন্নপূর্ণা দেবীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে স্বীকার করিয়ে নিলেন ছেলে হিসেবে। এঁর কাছ থেকেও অন্নপূর্ণা দেবী শিখে নিলেন আলতা, সিঁদুর বানানোর কৌশল। কুশলী অন্নপূর্ণা কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন আলতা -সিঁদুরে।

আসলে অন্নপূর্ণা দেবী যে ব্যবসাই করুন না কেন, তিনি সেটা করতেন বেশ যত্ন নিয়ে। তাই কৃত কর্মের ফল পেতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হত না। তিনি নানান মরশুমে মরশুমের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ঘুড়ির সময় ঘুড়ি, দোলের সময় রঙ, স্বরস্বতী পুজোর সময়

ঠাকুর, এমনকী কালী পুজোর সময় অন্যের থেকে কিনে এনে বাজিও বিক্রি করতেন ব্যবসায় বৈচিত্র্য আনার জন্য। এমনি করেই এসে গেল পরের পুজো। বাজি বিক্রি করতে করতে আবিষ্কার করলেন কমবয়সীরা তাঁকে বুড়িমা বলে সম্বোধন করছে। দিনের শেষে অবাক অন্নপূর্ণা। নিজেকে আয়নায় দেখে আবিষ্কার করলেন জীবনের নানান ওঠা পড়ার মাঝে কখন যেন তাঁর মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই তিনি হয়ে গিয়েছেন 'বুড়িমা'। তা বুড়ির দমে যাওয়ার বদলে এল নতুন উদ্যম। হোক না সাদা চুল। কুছ পরোয়া নেই। আরও বেশি বেশি করে বাজি কিনে এনে দোকান ভরানোর উৎসাহ এসে গেল তাঁর মাথায়। কিন্তু টাকা কোথায়? অগত্যা হা পিত্যেশ করে বসে বসে ভাবনা। ভাবনার কারণ জানতে পেরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন নমিতা দেবী। একহাজার টাকা ধার নিয়ে বড়বাজার থেকে বাজি এনে ভরিয়ে তুললেন দোকান বুড়িমা। এটা দেখি, বুড়িমা ওটা দেখি, কচিকাচাদের কিচিরমিচিরে মন ভরে গেল অন্নপূর্ণার। কিন্তু এবারে বিধি বাম। পুলিশ এসে জানতে চাইল বাজি বিক্রির সরকারি ছাড়পত্র তাঁর কাছে আছে কি না। তা না থাকায় সমস্ত বাজি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে চলে গেল তারা।

সারা জীবন ধরে সংগ্রামী জীবন–যাপন করা বুড়িমা অত সহজে দমে যাওয়ার পাত্রী নন। তাঁরও জেদ চেপে গেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শুধু বাজি বিক্রিই নয়, বাজি তৈরিও করবেন। আর তার জন্য যাবতীয় ছাড়পত্র তিনি জোগাড় করে ফেললেন। ছেলে তো মায়ের কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক। কিন্তু বুড়িমা এক মরশুমেই বাজি তৈরির কাঁচামাল, তা বানানোর পদ্ধতি প্রভৃতি জানার জন্য হাওড়ার বাঁকরা, বজবজের নুঙ্গি চষে ফেললেন। যখনই তিনি নতুন নতুন ব্যবসায় হাত দিয়েছেন, তখনই তাঁর সামনে দেবদূতের মতো হাজির হয়েছেন কখনও সনাতন, কখনও হরকুসুম , কখনও বা নমিতা । এবারেও বাজি বিশারদ আকবর আলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। নিজের হাতে শিখে

নিলেন বাজি তৈরির হরেকরকম পন্থা। তারপরই তাঁর এক মাত্র ধ্যান-জ্ঞান হল বাজি তৈরি।

কিন্তু সেই বাজির তো কিছু একটা নাম রাখতে হবে। নিজের পরিচয়েই তৈরি হল বাজির ব্র্যান্ড। নাম দেওয়া হল ‘বুড়িমা’। ওই নামেই তিনি কচিকাচা-দের কাছে পরিচিত। সেই থেকেই শুরু হল ‘বুড়িমা’র জয়যাত্রা। একে একে তিনি রপ্ত হতে থাকলেন সোরা, গন্ধক, বারুদের বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণ ছেকে কীভাবে নানা রকমের বাজি তৈরি করা যায়। তবে হরেক কিসিমের বাজি বানালেও রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন যেটা বানিয়ে, তা হল বুড়িমার চকলেট বোম। টালা থেকে টালিগঞ্জ, হাওড়া থেকে বারাসত সব জায়গাতেই বিখ্যাত হয়ে উঠল এই নাম। এক মরশুম থেকে আর এক মরশুমের মাঝে ব্যবসাকে কী করে আরও বাড়ানো যায় সেই চিন্তাতেই কাটত বুড়িমার দিন।

এর ফাঁকেই তিনি তালবান্দা আর ডানকুনিতে তৈরি করে ফেললেন আরও দুটো কারখানা । ছেলে সুধীর-নাথকে কুঁড়েমি কাটানোর জন্য রবার

ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। এবার ওই কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বসালেন কারখানায়। নিজে আরও বড়, আরও বড় কারখানা, আরও বড় ব্রাণ্ডিং – এর প্রয়োজনে পাড়ি দিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত বাজি শহর শিবকাশীতে। সেখানেই লিজে জমি নিয়ে একটা কারখানা গড়ে তৈরি শুরু করলেন দেশলাই। রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এবার বুড়িমার নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। ইতি মধ্যে সুরদের কাছ থেকে পিয়ারি মোহন স্ট্রিটে জোগাড় করলেন আরও জমি। এখানে নিজেদের আবাসস্থল তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুললেন একটা বড় গুদামঘরও। ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস, বুড়িমা ১৯৯৫ সালে দেহত্যাগ করার পরই ১৯৯৬ সাল থেকে কিছু বছর শব্দবাজি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদিও ইতি মধ্যে শব্দ বাজির ঊর্ধ্বসীমা ৯০ ডেসিবেলের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওই শব্দ মাত্রার ওপরের বাজি ওখানে বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়। বাজি ফাটানো যাবে কিনা, তা নিয়ে মাঝে মাঝেই আদালতে মামলা হয়। জল গড়ায় হাইকোর্ট, এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও। কিন্তু বাজিকে ঘিরে নস্টালজিয়া। সেখানে তো আর কোর্টের হাত নেই। শুধু চকলেট বোম নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরও নানা ধরনের বাজিরই বিপণন এখনও হয়ে চলেছে। আর তা করে চলেছেন তাঁর দুই সুযোগ্য নাতি সুমন আর রমেন দাস। তাঁরা জানালেন, বিনা শব্দের বাজির মধ্যে তাঁরা এনেছেন বিভিন্ন বৈচিত্র্য। এসব প্ল্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে একেবারে নতুন প্রজন্মের মানুষ সুমন দাসের ছেলে সদ্য এম বি এ পাশ করা সুমিত দাসের নেতৃত্বে। না থেকেও আছেন বুড়িমা। আছে দুরন্ত সেই লড়াইয়ের রূপকথা।

স্পেশ্যাল ফিচার

বেঙ্গল টাইমস মানেই আকর্ষণীয় স্পেশ্যাল ফিচার। দৈনন্দিন খবরের ভিড়ে একটু অন্যরকম স্বাদ। চাইলে আপনিও সময়োপযোগী ফিচার পাঠাতে পারেন।

❑ শব্দসংখ্যা: ৫০০ থেকে ৮০০।

❑ পিডিএফ নয়, লেখা পাঠান ইউনিকোডে।

❑ লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

হুজুগের এমন উর্বর জমি, কে না চাষ করতে চাইবে!

তমাল ভৌমিক

বছরখানেক আগেও ধনতেরাস উৎসবের কথা শুনেছিলেন? পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন? হিন্দি বলয়ের এই উৎসব কবে যেন বাংলার ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছে। টিভিতে ধনতেরাসের বিজ্ঞাপনের ছয়লাপ। কাগজে কাগজে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন। এসব ঢাউস বিজ্ঞাপনের ফল যে পাওয়া যাচ্ছে, তা তো গয়নার দোকানের ভিড় দেখলেই বোঝা যায়।

অনেকদিন আগে একটা কথা শুনেছিলাম, যার ভেতরে কোনও অলঙ্কার নেই, তাকে বাইরের অলঙ্কার দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে হয়। অর্থাৎ, আরও সহজ ভাষায় বললে, অলঙ্কার হল মূর্খের অবলম্বন। সে দামী গয়না পরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। এই রোগটি মহিলাদের

একতরফা, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। অলঙ্কারধারী পুরুষেরও অভাব নেই। যত দিন যাচ্ছে, এই প্রবণতা বাড়ছে। আর মূর্খামি এমনই এক বিষয়, যা ঢাক পিটিয়ে না জানালেই নয়। তাই অব-লীলায় দন্ত বিগলিত করে বাঙালি সেই গয়না পরার ছবি আপলোড করে। এমনকী গয়নার দোকানে দাঁড়িয়ে আছি, সেই সেলফি তুলে আপলোড না করলে তাঁর পেটের ভাত হজম হয় না।

টিভিতে সিরিয়ান মানেই যেন অলঙ্কারের বিজ্ঞাপন। রান্নাঘরে রান্না করছে, গা ভর্তি গয়না। ড্রয়িংরুমে কুটকচালি করছে। সেখানে গয়না। পাঁচ মহিলা দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে, পাঁচজনের গায়েই দামী শাড়ি, পাঁচজনের পরণেই যেন বিয়েবাড়ির সাজ। সে ভোরের দৃশ্য হোক বা রাতের। সিনেমাতেও কায়দা করে পিসি চন্দ্র, অঞ্জলি জুয়েলার্স, বলরাম বসাক— এসব ঢুকে পড়ছে। কখনও দোকানের ছবিতে, কখনও নায়ক-নায়িকার সংলাপে। এভাবে বাঙালির অন্দরমহল না জেনে, না বুঝে গিলছে অলঙ্কারকে।

অনেকে রেগে যেতেই পারেন, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে যত অলঙ্কার পরে, তার কথায় বুদ্ধি -যুক্তির ছাপ তত কম। ভাবেন, গয়না পরলে বোধ হয় তাঁদের দারুণ সুন্দর লাগছে। পুরুষ বোধ হয় তাঁদের দিকে তাকিয়েই থাকবে। হ্যাঁ, গয়না দেখে তাকিয়ে থাকা পুরুষের অভাব নেই। স্থূল ও চটুল জিনিসের কদর করার লোক সবসময়ই বেশি।

বাঙালি নবান্ন, পিঠে পরব ভুলতে বসেছে। আঁকড়ে ধরছে ধনতেরাসকে। হুজুগপ্রিয়তার এমন উর্বর জমি, কে না চাষ করতে চাইবে? তাই গয়নার কোম্পানিগুলোও বাজার ধরতে লাফিয়ে পড়েছে। ধনতেরাস ধামাকার নামে আদেখলাপনাই বুঝিয়ে দেয় ‘এগিয়ে বাংলা’র ছবিটা আসলে কেমন।

ধনতেরাস নিয়ে বাঙালির এত আদিখ্যেতা কেন?

রুমা ব্যানার্জি

বিগত দুই দশক বা তার বেশি সময় বাঙালির ‘বারো মাসে তেরো পার্বণে’ যুক্ত হয়েছে অনেকগুলি তথাকথিত উৎসব। ধনত্রয়োদশী বা ধন্বন্তরী ত্রয়োদশী, সংক্ষেপে ধনতেরাস তার অন্যতম। কিছু দিন আগেও এই ধনতেরাস উৎসব শুধু মাত্র অবাঙালিদের বা উত্তর ভারতের কিছু অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতি বছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পালিত হয়ে থাকে ধনতেরাস। ধনতেরাস থেকেই শুরু হয় পাঁচ দিনের দীপাবলি উৎসব। শেষ হয় ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায়।

শাস্ত্রমতে ধনতেরাসের দিন মা লক্ষ্মীর পূজার বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে। ধনতেরাসের আগে

সারা বাড়ি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়। কারণ মা লক্ষ্মী অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন না। এইজন্যই ধনতেরাসের দিন সারা বাড়ি, বিশেষ করে মূল প্রবেশ পথের ওপর আলপনা দিতে হয়। মা লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা আঁকা হয়। এরপর নিজের মতো করে মা লক্ষ্মী দেবীকে এবং ধন সম্পদের রক্ষাকর্তা কুবেরের পূজা করতে হয়। অনেকের বিশ্বাস, এইদিনে কোনও ধাতব দ্রব্য কিনলে তা পরিমাণে তেরো গুণ বৃদ্ধি পায়। এই ধারণা থেকেই ধন-তেরাসে সোনা রুপা কেনার প্রচলন রয়েছে। তবে শাস্ত্রমতে, এইদিনে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনও শুদ্ধ ধাতু কেনায় মঙ্গলজনক। তাতে আসবে সমৃদ্ধি।

কথিত আছে, রাজা হিমার ছেলের এক অভিশাপ ছিল। তার কুষ্টিতে লেখা ছিল, বিয়ের চার দিনের মাথায় সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হবে। তার স্ত্রীও জানতেন সেই কথা। তাই সেই অভিশপ্ত দিনে সে তাঁর স্বামীকে ঘুমোতে দেননি। শয়নকক্ষের বাইরে তিনি সমস্ত গয়না ও সোনা রূপার মুদ্রা জড়ো করে রাখেন। সেই সঙ্গে সারা ঘরে বাতিও জ্বালিয়ে দেন। স্বামীকে জাগিয়ে রাখতে সারারাত তাঁকে গল্প শোনান, গান শোনান। রাতে যখন মৃত্যুর দেবতা যম তাঁদের ঘরের দরজায় আসেন, আলো আর গয়নার জৌলুসে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। রাজপুত্রের শোয়ার ঘর পর্যন্ত তিনি পৌঁছন ঠিকই। কিন্তু সোনার উপর বসে গল্প আর গান শুনেই তাঁর সময় কেটে যায়। ফলে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই চলে যান তিনি। রাজপুত্রের প্রাণ বেঁচে যায়। পরদিন সেই আনন্দে ধনতেরাস পালন শুরু হয়।

পুরাণ মতে, সমুদ্র মন্থনে কুবেরের সঙ্গে উঠে এসেছিলেন দেবী লক্ষ্মী। সেই দিনটি ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। এই দিনই লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতে গোটা দেশ। মতান্তরে, ধনতেরস সোনার গয়না নয়, আয়ুর্বেদ ওষুধ কেনার দিন। মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য রক্ষায় আয়ুর্বেদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাশীরাজ ধন্বন্তরীর চেষ্টায় আয়ুর্বেদ সারাদেশে প্রসিদ্ধ হয়। তাই আয়ুর্বেদ ও মহৌষধের কথা উঠলেই বলা হয় ধন্বন্তরীর নাম। তিনি ত্রয়োদশী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তিথি ধন্ব-ন্তরী ত্রয়োদশী হিসাবে পালিত হয়। হিন্দিতে এটাকে ধন্বন্তরী তেরস বা সংক্ষেপে ধনতেরস বলে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে, সব উৎসবের সূচনা হয় ভীতি বা আনন্দের প্রকাশে। সম্ভবত শীতের সময় যাতে খাদ্যের

অভাব না হয় তাই কিছু ধন সম্পদ একত্রিত করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। তখন অবশ্য ধন সম্পদ বলতে গবাদি পশু, শস্য বোঝানো হত। খাদ্য শস্য, লবণ, আর তেল মজুত করা হত যাতে পরের শস্য বা ধান পাকা পর্যন্ত ভাঁড়ারে টান না পড়ে। সময়ের বিবর্তনে পরে ধাতু এবং সোনা রূপায় পরিবর্তিত হয় সম্পদের সংজ্ঞা। শুরু হয় সোনা রুপো কেনা। সাধারণ মানুষ যাঁদের তেমন ক্রয়ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা বাসন কিনতেন এই দিনে। কিন্তু কখনই তাঁরা ঝাড়ু-ঝাঁটা কিনতেন না। ইদানিং কয়েক বছর ইউটিউবের দৌরাত্ম্যে এইসব কেনার ধুম পড়েছে। আসলে যে যা বলে দিচ্ছে তার পেছনেই ছুটছে মানুষ।

এই লৌকিকতা প্রায় উৎসবের অঙিনায় পৌঁছে দিয়েছে মিডিয়া। তাই আজ শ্যামা পূজা বা দীপাবলীর সঙ্গে বড় করে উদ-যাপিত হয় ধনতেরাস। বাঙালি অবাঙালি তাই এখন পঞ্জিকা মেনে পৌঁছে যায় সোনার দোকানে। সেখানে লম্বা লাইন বুঝিয়ে দেয় আমাদের জনজোয়ারে গা ভাসানোর ধুম। খবরের কাগজে, বেতার, দূরদর্শন, পাড়ার মোড়ে, পথের দু-ধারে তাই এখন শুধুই সোনার বিজ্ঞা-পন। এমনটা যদি হত তাহলে ধনতেরা-সের পর আমরা পৃথিবীর ধনীতম দেশ হয়ে উঠতাম নিশ্চয়ই।

এ বছর 'ধনতেরাসের ধুম' দেখে কে বলবে এই দেশের অর্থনীতি অতিমারির কবলে এখন বিধ্বস্ত হয়ে ধুঁকছে। এক শ্রেণীর মানুষের চাকরি নেই। অনেকেই অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ ন্যূনতম পরিষেবা পায় না। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার প্রাত্যহিক সামগ্রী অগ্নিমূল্য। নুন আনতে এখন পান্তা ফুরাচ্ছে।

এই সময় বিভিন্ন স্ট্যাটাস আপডেটে, সোনা কেনার ছবি, সোনার দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে ছবি দেখে সত্যি বিস্মিত আর ব্যথাতুর হই। ব্যবসায়ী মহলের আঙ্গুলি হেলনে আর আমরা কতদিন এমন মূর্খের স্বর্গে মেতে থাকব সেটাই এখন দেখার!

ছৌ মুখোশের চড়িদা গ্রামে একটি দিন

ছৌ নাচের কথা কে না জানেন! কোথায় তৈরি হয় সেই ছৌ–মুখোশ? অযোধ্যার লাগোয়া সেই চড়িদা গ্রাম থেকে ঘুরে এসে লিখলেন বুবুন ঘোষাল।

পুরুলিয়া বললেই সবার আগে কোন ছবিটা ভেসে ওঠে। যারা শিক্ষা অনুরাগী, তাঁরা হয়ত বলবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। যাঁরা ঘুরতে ভালবাসেন, তাঁরা হয়ত বলবেন অযোধ্যা পাহাড়ের কথা। হ্যাঁ, এই দুটোর কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে, এমন কোনও বিষয়? এমন কোনও লোকসংস্কৃতি? আর ক্লু দেওয়ার দরকার নেই। ছৌ নাচের ছবিটা এতক্ষণে নিশ্চয় মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ, এই ছৌ নাচের কথা বললে, এককথায় ভেসে ওঠে পুরুলিয়া জেলার নাম।

কিন্তু এই ছৌ মুখোশ কোথায় তৈরি হয়? হঠাৎ করেই সেই গ্রামে যাওয়ার সুযোগটা এসে গেল। আমরা গিয়েছিলাম পর্বতারোহনের প্রশিক্ষণ শিবিরে। এত

কাছে এলাম। আর ছৌ গ্রাম চড়িদায় যাব না? বাঘমুন্ডি থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। কয়েকটা বাইক নিয়ে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম চড়িদার পথে। গ্রামটা যে খুব আহামরি, এমন নয়। দক্ষিণ বঙ্গের আর দশটা গ্রাম যেমন হয়ে থাকে, অনেকটা সেরকমই। ছোট্ট গ্রাম। গোটা তিরিশেক পরিবার। সব পরিবারই কোনও না কোনওভাবে এই ছৌ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রামে যে মুখোশ তৈরি হয়, সেটাই পৌঁছে যায় দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও।

গ্রামের মানুষগুলি বেশ সাধাসিধে। মুখোশ বানালেও ওদের মুখে কোনও মুখোশ নেই। একটু কান পাতলেই ওদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবেন। বংশ পরম্পরায় চলছে ঠিকই। কিন্তু কতদিন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, ওঁরা নিজেরাও সংশয়ে। এক প্রবীণ শিল্পী বলছিলেন, আমাদের তৈরি মুখোশ বিদেশে মোটা দামে বিক্রি হয় শুনেছি। কিন্তু সেই টাকা তো আমাদের ঘরে আসে না। কাদের কাছে যায়, কে জানে!

মূলত কাগজ আর আঠা দিয়েই তৈরি হয় এই মুখোশ। গ্রামের ৪–৫ বছরের শিশু যেমন কাজ করছে, তেমনি ৮০ বছরের বয়স্ক মানুষটিও দিব্যি হাত লাগাচ্ছেন। বাড়ির মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কেউ শুরুর দিকটা এগিয়ে দেয়। কেউ ফিনিশিংয়ে বেশি পারদর্শী। কারও হাতে রঙের কাজ দারুণ খেলে। কেউ কাগজ কেটে রাখে, কেউ আঠা তৈরি করে। সব ঘরেই কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে। সব ধরনের মুখোশ যে সবাই বানাতে পারেন, এমন নয়। মূলত পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই হয় ছৌ পালা। রামায়ন, মহাভারত, মহিষাশূরমর্দিনী এগুলোই বেশি জন-প্রিয়। এইসব পালার বিভিন্ন চরিত্রের আলাদা আলাদা মুখোশ।

এই মুখোশগুলো কি শুধু ছৌ শিল্পীদের

জন্য? মোটেই না। আপনি-আমিও কিনতে পারি। ছৌ নাচ নাচতে নাই বা পারলেন। বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে তো আপত্তি নেই। শহুরে অনেক বাড়িতেই শোভাবর্ধন করে এই মুখোশ। যাঁরাই অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে আসেন, তাঁদের অনেকেই ঘুরে যান এই গ্রাম থেকে। শীতের এই সময়টায় পরিযায়ী পাখিদের মতোই বিদেশিদের আনা-গোনাও লেগেই থাকে। বিদেশিরা আসার আগে নেট ঘেঁটে এ তল্লাটের নানা হেরিটেজের কথা আগেই জেনে আসেন। আর সেই হেরিটেজের তালিকায় চড়িদা গ্রাম তো আছেই। তাঁরাও এই গ্রামে আসেন, ছবি তোলেন, ভিডিও তোলেন। কত তথ্যচিত্র যে তৈরি হয়েছে, তার হিসেব কে রাখে! দেশি-বিদেশি কোন ম্যাগাজিনে কোন ছবি ছাপা হচ্ছে, তার হদিশও পাওয়া মুশকিল। এভাবেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামে এসেই অনেকে মুখোশ নিয়ে যান। আবার শীতের সময় রাজ্যের নানা প্রান্তে মেলা বসে। সেখানেও ডাক পড়ে শিল্পীদের। সেইসব মেলায় বিক্রি হয় ভালই। কখনও এজেন্ট মারফত নানা জায়গায় যায়। অনলাইনে কেনার সুযোগ নেই ঠিকই, তবে ফোনে অর্ডার দেওয়াই যায়। ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন কি চড়িদার কথা জানে! জানলে হয়ত বিপণনের নতুন দরজা খুলে যেত। আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে পারত।

ব্যস্ততার মাঝেও চিঠি লিখতে ভুলতেন না

ঋষভ সোম

ব্যস্ততার মাঝেও কীভাবে সময় বের করে নিতে হয়, তিনি জানতেন। চিঠি লেখায় তাই বিরাম পড়েনি। নিয়মিত পাঠকদের চিঠির উত্তর দিতেন। তাঁর লেখা চিঠি কত হাজার হাজার পাঠকের কাছে সারাজীবনের সম্পদ হয়ে আছে। বোঝা গেল, যাঁরা সত্যিকারের ব্যস্ত, তাঁরা ঠিক সময় বের করে নিতে জানেন। লিখেছেন উত্তম জানা।

যাঁরা ব্যস্ত মানুষ, তাঁরা বোধ হয় ঠিক সময় বের করে নিতে পারেন। যাঁরা ততখানি ব্যস্ত নন, তাঁরাই বোধ হয় ‘সময় নেই’ অজুহাত দেন। বুদ্ধদেব গুহ যেন এই চরম সত্যিটাই আরও বেশি করে দেখিয়ে গেলেন।

গত এক-দু মাসে অনেকেই নানারকম স্মৃতিচারণ করেছেন প্রয়াত লেখকের। সেই স্মৃতিচারণে মোদ্দা যে কথাটা উঠে এসেছে, তা হল, তাঁকে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যেত। বিখ্যাত লোকেদের তিনি হয়ত প্রচুর চিঠি লিখেছেন। সেগুলি নানা জায়গায় সংকলিতও হয়েছে। কিন্তু একেবারে সাধারণ পাঠকদেরও নিরাশ করেননি। যে কেউ চিঠি লিখে তাঁর উত্তর পেয়েছেন। কেউ পত্রিকা পাঠালে তিনি পড়েছেন। মতামত জানিয়েছেন। সেই চিঠিগুলি পাঠকের কাছে পরম এক সম্পদ হয়ে আছে। গত কয়েকদিনে সোশ্যাল মিডিয়া বা হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন গ্রুপে এমন অসংখ্য চিঠির সন্ধান পাওয়া গেল।

বুদ্ধদেব গুহ কি খুব কম ব্যস্ত ছিলেন? দিনে প্রায় বারো ঘণ্টা সময় এমন আবহে কাটিয়েছেন, যার সঙ্গে সাহিত্যের সুদূরতম সম্পর্কও নেই। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম সফল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আজ এই ট্রাইব্যুনাল, কাল ওই ট্রাইব্যুনালে ঘুরতে হয়েছে। আজ দিল্লি, কাল মুম্বই যেতে হয়েছে। মক্কেলদের জন্য পড়াশোনা

করতে হয়েছে, প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এর সিকিভাগ ধকল নিয়েই আমরা হয়ত ক্লান্ত হয়ে যেতাম। মনে হত, ঢের করেছি। এবার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

আর উনি কী করেছেন? এই জঙ্গল থেকে ওই জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। একের পর এক কালজয়ী লেখা লিখে গেছেন। পড়াশোনার পেছনেও বড় একটা সময় ব্যয় করেছেন। সেই তালিকায় অতীতের কালজয়ী লেখকরা যেমন আছেন, বর্তমান সময়ের একেবারে অনামী লেখকরাও আছেন। খুব কম সাহিত্যিকই অন্যের লেখা পড়েন। যাঁরা পড়েন, সেই তালিকায় একেবারে অগ্রগণ্য বুদ্ধদেব গুহ। নিয়মিত অন্যের লেখা পড়তেন, চিঠি লিখে উৎসাহ দিতেন।

হ্যাঁ, এই চিঠি লেখা। যে কাজটা এখন প্রায় উঠেই গেছে। তিনি কিন্তু এই বিরল শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। নিজের দৈনন্দিন জীবনচর্চার অঙ্গ করে তুলেছিলেন। সত্যজিৎ রায় নাকি ভোরে উঠেই চিঠি লিখতে বসতেন। বুদ্ধদেব গুহ কখন চিঠি লিখতেন? সকালের দিকে? নাকি রাতের দিকে? নাকি কাজের ফাঁকে? জানি না। দিনে ঠিক কতগুলো চিঠি লিখতেন, তাও জানি না।

এই ফেসবুক, টুইটারের যুগে আর কোনও লেখক কি এভাবে পাঠককে চিঠি লেখেন? তাও জানি না। হয়ত হোয়াটসঅ্যাপে উত্তর দেন। হয়ত দু এক লাইনের মেসেজ করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ না কম্পিউটারের লিখেছেন। না স্মার্টফোনে উত্তর দিয়েছেন। তিনি সরাসরি চিঠিই লিখতেন।

বোঝা গেল, যাঁরা সত্যিকারের ব্যস্ত মানুষ, তাঁরা ঠিক সময় বের করে নিতে পারেন। আর যাঁরা পারেন না, তাঁরাই ব্যস্ততার অজুহাত দেন। যাঁরা তেমন সাহিত্য অনুরাগী নন, তাঁদের কাছেও অন্তত এই একটা ব্যাপারে মোক্ষম শিক্ষা দিয়ে গেলেন কিংবদন্তি এই মানুষটা।

বিভূতিভূষণ এখানে কখনও খেতে আসেননি

দিব্যেন্দু দে

একেবারেই সাম্প্রতিক একটি ওয়েব সিরিজ— রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি। পূর্ববঙ্গের একটি হোটেলের পটভূমি। সেই ভাতের হোটেলকে ঘিরে নানা ওঠা-পড়া। কিন্তু নামকরণেই রয়েছে অদ্ভুত এক চমক।

তেমনই একটি হোটেলের কথা। রানাঘাটের আদর্শ হিন্দু হোটেল। রানাঘাট স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়েই চোখে পড়বে এই হোটেলটি। মনে পড়ে যাবে বিভূতিভষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এই রানাঘাট স্টেশন সংলগ্ন একটি ভাতের হোটেলকে নিয়ে লেখা তাঁর কালজয়ী উপন্যাস— আদর্শ হিন্দু হোটেল। সেই হাজারি ঠাকুর। সেই পদ্ম ঝি। আরও কত চরিত্র। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আটের দশকের শেষদিকে চমৎকার একটা সিরিয়ালও হয়েছিল। মনোজ

মিত্র, সাবিত্রী চ্যাটার্জির সেই অভিনয়ের কথা এখনও মুখে মুখে ফেরে।

অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল এই হোটেলে একদিন খাওয়ার। কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে, একদিন সুযোগটা এসেই গেল। গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগর। ফেরার পথে কী মনে হল, নেমে পড়লাম রানাঘাটে। অন্য কোনও কারণে নয়। স্রেফ ওই হোটেলে একদিন খাব বলেই। এই হোটেলকে নিয়ে এমন কালজয়ী উপন্যাস! মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা শিহরণ কাজ করছিল। দোকানে বেশ ভিড় ছিল। ফলে, শুরুতে মালিকের সঙ্গে বা কর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার তেমন সুযোগ ছিল না। এত খদ্দেরের ভিড়ে দোকানের ইতিহাসের কথা বলতে হলে তাঁরা হয়ত বিরক্তই হতেন। সত্যিই তো, একই ইতিহাস কতবারই বা বলবেন!

নীচে এখন একটা মিষ্টির দোকান। নাম আদর্শ সুইটস। পাশ দিয়ে গেছে সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয় দো'তলায়। বেশ ছিমছাম, সাজানো। বিভূতিবাবুর ছবি টাঙানো। এখান থেকে স্টেশন দেখা যায়। ট্রেনের আসা-যাওয়াও দেখা যায়। বিভূতিবাবুর ভাবনায় নিশ্চয় এমন দোতলা ছিল না। সেখানে ছিল দরমার বেড়া। খড়ের ছাউনি। কলাপাতা। স্টেশন থেকে খদ্দের ডেকে আনতে হত। হাজারি ঠাকুরের রান্নার এমনই সুখ্যাতি, খদ্দেররা ঠিক ভিড় জমাত।

কিন্তু যা হয়! লোকের অধীনে কাজ করতে গিয়ে নানান সমস্যা। এমনকী চুরির অপবাদও মাথায় নিতে হল। হাজারি ঠাকুরের অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল নিজের একটা হোটেল তৈরি করবেন। সেখানে নিজের হাতে রান্না করে খদ্দেরদের খাওয়াবেন। কোনও খদ্দেরকে ঠকাবেন না। কিন্তু তাঁর সেই সামর্থ্য কই? এদিক-ওদিক থেকে টাকার জোগাড় হয়ে গেল। স্টেশনের গায়েই তৈরি হল আদর্শ হিন্দু হোটেল। মালিক হওয়া সত্ত্বেও ক্যাশবাক্স নয়, তাঁর ঠিকানা সেই রান্নাঘর।

আমি কোনওকালেই রাঁধুনি নই। চা, চাউমিন, কাজ চালানো খিচুড়ি, ডিম ভাজা— এই আমার রান্নার দৌড়। বেশি সময়ও নেই, সেই নিষ্ঠাও নেই। কিন্তু নিজের কাজটা বরাবরই যত্ন নিয়ে করি। তাই হাজারি ঠাকুরের সঙ্গে নিজের কোথায় একটা মিল পেতাম। সেই কারণেই হয়ত এই উপন্যাসটা আমার এত প্রিয়। সেই কারণেই রানাঘাটের এই হোটেলে একদিন

ভাত খাওয়ার এমন তীব্র ইচ্ছে।

দোকানে একইসঙ্গে ঐহিত্য আর আধুনিকতার মিশেল। দিনের বেলায় এখনও সেই সাবেকি ভাতের হোটেল। কলাপাতা নেই, তবে কাগজের প্লেটে কলাপাতার আদল আছে। ভাত, ডাল, নানা রকমের তরকারি, ভাজাভুজি। পাঁঠার মাংস। সঙ্গে নানা রকমের মাছ। তবে সন্ধের পর চেহারা অন্য-রকম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তখন মোগলাই, চাইনিজের হরেক আয়োজন। দাম যে খুব বেশি, তাও নয়। মোটামুটি অন্যান্য রেস্তোরাঁর মতোই।

আচ্ছা, হাজারি ঠাকুর থাকলেও কি আজ এভাবেই চাইনিজ, মোগলাই করতেন? হয়ত করতেন। কারণ, উপন্যাস পড়ে যেটুকু মনে হয়েছে, তিনি সময়ের দাবি বুঝতেন। খদ্দেরের চাহিদা ও তৃপ্তির কথা বুঝতেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই ভালবাসতেন। তাই তিনিও হয়ত চাইনিজ, মোগলাই আয়ত্ব করে নিতেন। ভাত, ডাল, মুড়ি ঘণ্টের সঙ্গে যখন সর্ষে ইলিশ দিয়ে গেল, মনে হচ্ছিল ভেতরে বোধ হয় সেই হাজারি চক্কোত্তি মশাই রান্না করছেন।

না, বিভূতিবাবুর সময় সত্যিই এই হোটেল ছিল না। তবে এই বাড়ির সঙ্গে

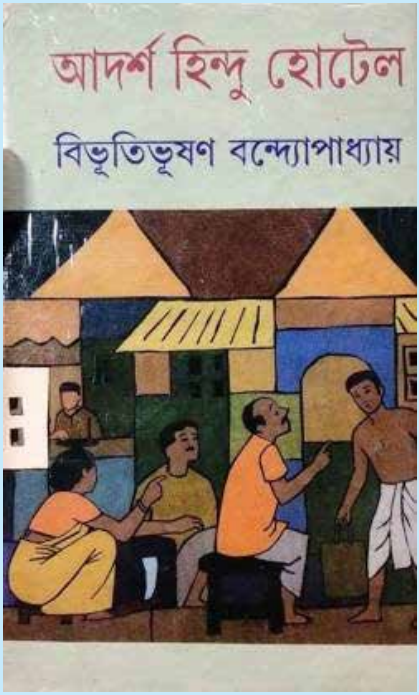

তাঁর একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এটা ছিল তাঁর মাসির বাড়ি। মাঝে মাঝেই পথের পাঁচালির স্রষ্টা এই বাড়িতে আসতেন। থাকতেন। কখনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে লোকজনের আসা যাওয়া দেখতেন। আবার কখনও হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন চূর্ণী নদীর দিকে। আশপাশের কিছু হোটেল হয়ত দেখেওছিলেন। মনে মনে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই কালজয়ী উন্যাস।

এই দোকানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই গোপীনাথ কুণ্ডু অবশ্য প্রথমে উপন্যাস

পড়েননি। বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পর এই উপন্যাস নিয়ে একটি নাটক হয়েছিল। কলকাতায় একবার সেই নাটকটি দেখেন। তখনই নামটি মাথায় গেঁথে যায়— আদর্শ হিন্দু হোটেল। এখন যেখানে, সেখানে নয়, এখান থেকে একটু দূরে। তখন ছিল মাটিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পরে বিভূতি বাবুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটা কিনে নিলেন। এখানেই উঠে এল আদর্শ হিন্দু হোটেল। অনেকেই ভাবতেন, এই হোটেলেই হয়ত বিভূতিভষণ খেতেন। বা এই হোটেলকে ঘিরেই তিনি হয়ত ওই উপন্যাস খানা লিখেছেন। কিন্তু আসল সত্যিটা হল, উপন্যাসটা লেখার পর, বিশেষত সেটা নাটক হওয়ার পর, এই নামের হোটেলটি তৈরি হয়। পরে আটের দশকে এই কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয় সিরিয়াল হয়। ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় আদর্শ হিন্দু হোটেলের কথা। আশপাশের অনেকেই তখন এখানে খেতে আসতেন। যেমন এখনও আসেন। আর যেহেতু বাইরে থেকে এত খদ্দের স্রেফ এই নামটার জন্যই আসে, তাই মানটাও ধরে রাখতে হয়েছে। হাজারি চক্কোত্তির মতো না হোক, অন্তত ভাল মানের রাঁধুনি রাখতে হয়েছে। তাই ভাত –ডালের হোটেলে সীমাবদ্ধ না থেকে চাইনিজ–মোগলাইয়ের আমদানি করতে হয়েছে।

গোপীনাথবাবু নেই। তাঁর ছেলে অমরনাথ কুণ্ডু এখন ক্যাশবাক্সে বসেন। চাইলে একটু জল মেশাতেই পারতেন। বলতেই পারতেন, এখানে বিভূতিভূষণ খেতেন। কিন্তু তিনি সত্যিটাই বলেন। তিনি অকপটেই বলেন, 'বিভূতিবাবু এই হোটেল দেখে যাননি। তখন এই হোটেল ছিলও না। তাঁর এই উপন্যাসের নাম অনুসারে আমার বাবা এই হোটেল তৈরি করেন।' চারিদিকে যখন বাড়িয়ে বলার হিড়িক, তখন ষাট বছরে একটু জল মেশাতেই পারতেন। কোথাও একটা সংযম ধরে রেখেছেন। জানেন, কতটুকু বলতে হয়। কোনটা বলতে নেই। এই সংযমটা কজনের থাকে!

বিভূতিভূষণ আসুন আর নাই আসুন, এই নামটার একটা বাড়তি আকর্ষণ তো আছেই। এই বাংলায় এমন নামের হোটেলের অভাব নেই। সব জেলাতেই পাবেন। কিন্তু রানাঘাট স্টেশনের বাইরেই। সেই বাড়িতেই। আশপাশের অনেক ছবিও দিব্যি মিলে যায়। সাহিত্যের একটা গন্ধ তো আছেই। আমিও তো গিয়েছিলাম সেই গন্ধের টানেই।

আহারে বাহারে

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— আহারে বাহারে। এই বিভাগে থাকবে বিভিন্ন হেরিটেজ হোটেল, রেস্তোরাঁ বা খাবারের কথা। সেটা রেস্তোরাঁ না হয়ে চা, সরবত বা মিষ্টির দোকানও হতে পারে।

কলকাতার নানা প্রান্তে এমন কত দোকান ছড়িয়ে আছে। জেলায় জেলায় এমন কত প্রাচীন দোকান ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের গন্ধ মাখা সেইসব দোকান বা খাবারের কথা আপনিও লিখতে পারেন। সেই দোকানের ঐতিহ্যের পাশাপাশি মিশে থাকুক আপনার অনুভূতিও। লেখার সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন।

লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

Milton™ www.miltonconfectioneryllp.com Marko™

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করার জন্য এরিয়া সেলস অফিসার (ASO)-এর প্রয়োজন। FMCG সেক্টরে ন্যূনতম 5 বছরের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক। নিজের বায়োডাটা এই **09369731084** মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন অথবা এই ই-মেইল:miltonconfectioneryllp@gmail.com-এ নিজের বায়োডাটা পাঠাতে পারেন।

MILTON CONFECTIONERY LLP

KANPUR, U.P. • (M) : +91 7367814146, +91 9839132451

যোগাযোগ করার সময় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত • নন-ডিস্ট্রিবিউটর এলাকার জন্য ডিস্ট্রিবিউটররা যোগাযোগ করুন

রাজীব তো নিমিত্তমাত্র

রক্তিম মিত্র

তাঁর কোনওকিছুই হঠাৎ করে নয়। তিনি যে বিজেপিতে যাচ্ছেন, অনেক আগে থেকেই সেই দেওয়াল লিখন পরিষ্কার ছিল। কখনও একটু বেসুরো কথা। কখনও ক্যাবিনেটে গরহাজির। কখনও জেলায় জেলায় হোর্ডিং। হতেই পারত দর বাড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু তিনি তার থেকে একটু বেশিই এগিয়ে গিয়েছিলেন। যেখান থেকে ফিরে আসার রাস্তা ছিল না।

আবার তিনি যে তৃণমূলেই ফিরছেন, এটাও অনেক আগে থেকেই পরিষ্কার ছিল। ভোট পেরোতেই হিসেব কষে বেসুরো। দরজায় কড়া নেড়েই চলেছিলেন। কখনও ফেসবুক পোস্টে, কখনও বিজেপি-র থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে, কখনও এর-ওর বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতে। শুধু দরজাটা খোলার অপেক্ষা ছিল।

তবে তিনি যথার্থই বড় মাপের নেতা। কারণ, তাঁর দুটোই হল রাজ্যের বাইরে। বিজেপিতে যোগদান করলেন বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে দিল্লিতে উড়ে গিয়ে। তৃণমূলে ফিরে আসাটার সঙ্গেও বিমান-যোগ জড়িয়ে আছে। উড়ে গেলেন আগরতলায়। সেখানে ধরলেন দলের পতাকা। অনেকেই দিল্লিতে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘরওয়াপসিটা হয়েছে ঘরের মাটিতেই। সেদিক থেকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় একপ্রকার নজিরই গড়লেন। এই রাজ্যে আর কোনও নেতার সম্ভবত এই 'কৃতিত্ব' নেই।

অনেকে বলতে পারেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে এত কুকথা বলার পরেও সেই

তৃণমূলেই ফিরলেন। কিন্তু সত্যিই কি রাজীব সেই মানের কু কথার আশ্রয় নিয়েছেন? খুব বেশি পুরনো ঘটনা তো নয়। একটু স্মৃতি হাঁতড়ালেই পাওয়া যাবে। দল ছেড়ে গেলে, অন্য শিবিরের হয়ে ভোটে দাঁড়ালে যেটুকু না বললেই নয়, সেটুকুই বলেছেন। এবং সেটাও আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার জন্য। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে তেমন কোনও মারাত্মক অভিযোগ আনেননি। যে ভাষায় শুভেন্দু বা অন্যরা আক্রমণ করেছেন, শিক্ষিত-মার্জিত রাজীব কখনই সেই রাস্তায় হাঁটেননি। কোথাও একটা মাত্রাজ্ঞান ছিল। বিজেপির যে প্রচার, সেই প্রচারেও সেভাবে গলা মেলাতে দেখা যায়নি। বেগম বলা বা হিন্দু মুসলিম তাস খেলা— এসব থেকে যতটা সম্ভব দূরেই থেকেছেন। বাকিদের মতো বিধায়ক পদ ধরে রেখে দলবদল করেননি। শুভেন্দু এবং তিনি আগে মন্ত্রীসভা থেকে, পরে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করে তবে অন্য দলের পতাকা হাতে তুলেছিলেন। তাই অন্যদের থেকে তাঁর দলবদল একটু হলেও আলাদা।

মানতেই হবে, রাজীব ব্যানার্জি একজন অত্যন্ত সফল মন্ত্রী। খুব কম মন্ত্রী নিজের দপ্তরের কাজটা বোঝেন। রাজীব যখন যে দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন, দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। সেচ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে সীমিত ক্ষমতায় যেটুকু করা সম্ভব, তার অনেকটাই করেছেন। যাঁরা দপ্তরের খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন, এই দপ্তরে অন্য একটা মাত্রা এনেছিলেন এই উদ্যমী মন্ত্রী। সেচ থেকে নির্বাসিত

হয়ে কিছুদিন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরে। পরের দিকে বনদপ্তরে। এই দপ্তরে বিশেষ কিছু করার ছিল না। কিন্তু খুব দ্রুত দপ্তরের খুঁটিনাটি বুঝে নিয়েছিলেন। কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যেত, একজন লেখাপড়া জানা মানুষ কথা বলছেন। কথায় তথ্য থাকত, যুক্তি থাকত, মার্জিত আচরণ থাকত। দপ্তরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ও আগামীর রোড ম্যাপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। যেটা অধিকাংশ মন্ত্রীরই থাকে না। আরও একটু স্বাধীনতা পেলে হয়ত আরও ভালভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারতেন।

যাই হোক, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে নানা মহলে তাঁর নামে নানা বিদ্রুপ চলছে। হয়ত চলাটাই স্বাভাবিক। একজন যদি এক বছরের মধ্যে দু'বার ঠিকানা পাল্টান, সমালোচনা হবেই। কিন্তু একা রাজীবকে দায়ী করে কী লাভ? আপনি রাজীবকে ঘৃণা করেন নাকি এইরকম দলবদলের প্রবণতাকে ঘৃণা করেন, সেটা আগে ভেবে নিন।

আপনি এতদিন অমিত শাহকে চানক্য বলে এসেছেন। যিনি একেক রাজ্যে গিয়ে অন্য দলের বিধায়কদের ভাঙিয়ে এনে সরকার ফেলে দিচ্ছেন। আসাম থেকে গোয়া, মণিপুর, হরিয়ানা।

যেখানে বিজেপির সরকার হওয়ারই কথা নয়। কিন্তু কেনাবেচার মন্ত্রে সরকার হয়ে গেল। কর্ণাটক থেকে মধ্যপ্রদেশ, সেখানেও বিধায়ক কেনাবেচা করে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে জোর করে মন্ত্রীসভা বানিয়েছেন। এগুলোও নাকি মাস্টারস্ট্রোক। এমন চেষ্টা রাজস্থানেও হয়েছে। এর পেছনে নীতি, নৈতিকতা বা আদর্শ তো ছেড়ে দিন। ন্যূনতম চক্ষু-লজ্জা টুকুও নেই। তিনিই চার্টার্ড ফ্লাইট পাঠিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন রাজীব ব্যানার্জিদের। ভোটের আগে থেকেই জোর গুঞ্জন ছিল, বিজেপি যদি একশো কুড়িও পায়, তবু সরকার হয়ে যাবে। খোদ বিজেপি নেতারাই বলে বেড়াচ্ছিলেন। এই আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিটা কী? অমিত শাহ নাকি বাকিদের

কিনে নেবেন। তাহলেই বুঝে দেখুন, দলের নেতা-কর্মীরাই তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন। তাহলে আর খামোখা রাজীবকে গালাগাল দিচ্ছেন কেন?

এবার মুদ্রার অন্য পিঠ। দল ভাঙানোর ব্যাপারে এই রাজ্যে যাদের কোনও জুড়ি নেই। একজনও সদস্য নেই। কিন্তু জেলা পরিষদ দখল হয়ে যায়। সত্যিই নজিরবিহীন সাফল্য। সারা দেশে এমন নজির আছে কিনা সন্দেহ। এত জিতেও খিদে মেটে না। ২১০ আসন পেয়েও অন্য দলের জেতা বিধায়কদের ভাঙিয়ে এনে কেউ কেউ বাহাদুরি দেখায়। যেন বিরাট এক কৃতিত্ব। এটা যে গৌরবের বিজ্ঞাপন নয়, এই বোধটুকুও নেই। খোদ বিধানসভায় দলবদলুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দলীয় পতাকা। কে তুলে দিচ্ছেন? একজন কলকাতার মহানাগরিক (এখন পোশাকি নাম পুর প্রশাসক)। আরেকজন পরিষদীয় মন্ত্রী। তাই সব্যসাচী দত্তকে গালাগাল দেওয়ার আগে এঁদের গালাগাল দিন। স্পিকার মশাই জেনেও কিছু করতে পারলেন! কারণ তিনিও জানেন কার নির্দেশে বিধানসভার আঙিনায় এই দলবদল হয়েছে।

একজন অন্য দলে যেতে চাইতেই পারেন। সেই দলে মোহভঙ্গ হলে পুরনো দলেও ফেরার ইচ্ছে হতেই পারে। কিন্তু এই দুটোর কোনওটাই তাঁর একক ইচ্ছেতে সম্ভব নয়। যারা হাট করে দরজা খুলে দিচ্ছেন, তাদের দায়টা অনেক বেশি।

আপনি একজনকে চানক্য বলবেন। আরেকজনকে উন্নয়নের কাণ্ডারি বলবেন। আর বেচারা রাজীব গালাগাল খাবেন! এটা কেমন বিচার! রাজীবকে যদি গালাগাল দিতে চান, তাহলে যারা সাংবিধানিক দায়িত্বে থেকেও এই নির্লজ্জ দলবদল করিয়ে যাচ্ছেন, যাঁরা সেই দলবদল করিয়ে বাহবা নিচ্ছেন, আগে তাঁদের ধিক্কার দিতে শিখুন। তাঁদের অপরাধটা অনেক বেশি। রাজীবদের অপরাধ সেই

গোল দিয়ে গেল গোলন্দাজ

কুণাল দাশগুপ্ত

মতি নন্দী থাকলে নিশ্চয় বড় খুশি হতেন। পরিচালক ধ্রুব ব্যানার্জি একটা 'গোলা' ছবি উপহার দিলেন বাঙালির সেরা উৎসবে সেরা খেলা নিয়ে। 'গোলোন্দাজ' কিন্তু শুরুতেই পাঁচ গোল মেরে দিল বাজার চলতি তেঁতুলের আচার মার্কা ছবিগুলোকে।

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে নিয়ে ছবি বানানো চাট্টিখানি কথা নয়। বিষয়টা মোটেও জলবৎ তরলং নয়। বাংলায় ফুটবলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তাই দিয়ে ছবি হয় না। স্বল্প দৈর্ঘের ছবি হতে পারে। আসলে, তখন ফুটবল নিয়ে বা তার ইতিহাস নিয়ে সেই পর্যায়ের গবেষণা হয়নি। পরে যখন কেউ কেউ এই কাজে হাত দিলেন, তখন সেই ইতিহাস নির্মাণকারী মানুষগুলোই হারিয়ে গেছেন। এমনকী, তাঁদের কাছের মানুষেরাও নেই। ফলে, কিছুটা শোনা কথা, কিছুটা কল্পনা, লেখালেখিতে এগুলোই ডালপালা মেলেছে। ছবি তৈরির সময়ও কিছু গল্পের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাতে বাস্তব কতটা

নড়ে গেছে বলতে পারব না। কিন্তু ফুটবল যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের তৃষ্ণা যে মিটেছে সে বিষয়ে সংশয় নেই।

প্রশ্ন থাকতে পারে, ট্রেডস কাপের ফাইনালে এত ঘটনার ঘনঘটা আদৌ হয়েছিল কিনা সেই নিয়ে। মাঠের মধ্যে গান গাওয়া নিয়ে বা ফাইনালের দিন খুন-খারাপি নিয়েও সংশয় আসাটাই স্বাভাবিক। ফুটবলে যে ড্রিবলিং দেখানো হয়েছে, তার অনেকগুলোই সেই সময় হত কিনা সন্দেহ আছে। প্রামাণ্য ইতিহাসের পাশাপাশি একটু অতি নাটকীয়তা হয়ত আছে। হয়ত কেন, নিশ্চিতভাবেই আছে। এই ছবিতে হয়ত তার প্রয়োজনও ছিল। যেখানে পর্যাপ্ত তথ্য নেই, সেখানে একটু কল্পনার রঙ মেশানো তেমন দোষের কিছু নয়। অন্তত সিনেমার ক্ষেত্রে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখা উচিত।

অভিনয়ে নজর কেরেছেন শ্রীকান্ত আচার্য। নগেন্দ্রপ্রসাদের বাবা সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর ভূমিকায় বেশ সাবলীল অভিনয় করলেন। যেমন গান করেন ঠিক তেমনই। দেবের আন্তরিকতাও প্রশংসার দাবি রাখে। ব্রিটিশদের ভূমিকায় নাম না জানা শিল্পীরা এবং জমিদারের চরিত্রে অনির্বাণ ভট্টাচার্যের অভিনয়ও নজরকাড়া। ছোট্ট চরিত্রে মাত করলেন ক্রীড়া সাংবাদিক (এবং প্রাক্তন ফুটবলার) দুলাল দে। বারে বারে 'ধন্যি মেয়ে'র রবি ঘোষের কথা মনে পড়ছিল। বিশেষ করে তার 'জয় গুরু' শব্দ দুটো অন্য একটা ব্যঞ্জনা এনে দিল। দুলালই ছবিতে ফুটবলের অনুশীলন থেকে খেলার খুঁটিনাটি হাতে ধরে শিখিয়েছেন। কাহিনি নির্মাণ ও চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রেও তাঁর বড় ভূমিকা আছে।

বছর দশেক আগে মোহন বাগানের শিল্ডজয় নিয়ে 'এগারো' বলে একটা ছবি তৈরি হয়েছিল। মাঝের দশ বছরে আর তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। টুকিটাকি যেটুকু হয়েছে, সেখানে ফুটবল ছিল গল্পের শাখা হিসেবে। সেদিক থেকে ফুটবল মনস্ক বাঙালির একটা খিদে ছিলই। সেই খিদে অনেকটাই মিটিয়ে দিল গোলন্দাজ। ক্রিকেট নিয়ে যদি একটা 'লগান' হয়, ফুটবল নিয়ে একটা গোলন্দাজ হতেই পারে।

গানের বিষয়ে বলতে হয়, সে আমলের সুর কিন্তু ছিল না। তবে নায়কের তিন তলা বাড়ি টপকে মশা মারার মতো ভিলেন মারা যদি মেনে নিতে পারি, তবে এটুকু মানতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। গোলোন্দাজ বক্স অফিসে বোমা ফাটাবেই। আর পিছনে মহম্মদ হাবিব হয়ে থেকে যাবেন দুলাল দে।

পুরনো সিরিয়াল ফেরানো যায় না!

বৃষ্টি চৌধুরি

বাঙালির দুটি বড় অসুখ। এক, মোবাইল। দুই, সিরিয়াল। এই দুটো নিয়েই মেতে আছে গড় পড়তা বাঙালি। আর কোনও দিক নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। এখন সিরিয়ালের নামে যা হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিম্নরুচির। না আছে সাহিত্য, না আছে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ। সবাই ড্রয়িংরুমে সারাদিন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের গা ভর্তি গয়না। ঘরের মধ্যে কেউ এমন পোশাকে থাকে? এমন দামি শাড়ি পরে থাকে? এই প্রশ্নগুলোই উঠে এসেছে বেঙ্গল টাইমসের বিভিন্ন লেখায়। এবারেই সঙ্গত প্রশ্ন।

অথচ, সিরিয়াল মানে কিন্তু এমনটা ছিল না। বছর দশেক আগেও বেশ উপভোগ্য কিছু সিরিয়াল হত। এখন যাঁরা সিরিয়ালে সকাল থেকে সন্ধে ডুবে আছেন, তাঁদের প্রতি সত্যিই করুণা হয়। তাঁরা আসল সিরিয়ালের স্বাদ বোধ হয় পাননি। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের কাছে আমার আবেদন, এইসব নতুন সিরিয়াল না দেখিয়ে দু-একটা পুরানো সিরিয়ালকে রিপিট করা যায় না? হিন্দিতে কিন্তু এই প্রবণতা আছে। আটের দশকের রামায়ণ বা মহাভারতকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এমনকি হামলোগ, বুনিয়াদ বা মালগুডিউ ডেজ-এর মতো সিরিয়ালকে আবার দেখানো হচ্ছে। তাহলে আটের দশকের 'তের পার্বণ' বা 'সেই সময়' ফিরতে বাধা কোথায় ?

আমাদের কিশোরীবেলার একের পর এক ভাল সিরিয়ালের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রবি ঘোষের দুটি অসাধারণ সিরিয়াল ছিল – গোয়েন্দা ভগবান দাস, অভিনন্দন ভগীরথ। মনোজ মিত্র, সাবিত্রী চ্যাটার্জির 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এর কথা এখনও মনে পড়ে। সাহিত্য নির্ভর আরও কত অসাধারণ সিরিয়াল, যেগুলি আমাদের সাহিত্য পড়ার খিদেকে উস্কে দিয়েছিল। এখনকার মতো রোজ হত না। সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন। সেই অপেক্ষায় বসে থাকতাম। সেই অপেক্ষার আনন্দই ছিল আলাদা।

নতুন সিরিয়াল নির্মাণ করতে যা খরচ, পুরানো সিরিয়াল দেখাতে সেই তুলনায় কোনও খরচই নেই। যেটুকু খরচ, আশা করি বিজ্ঞাপন থেকে নিশ্চয় উঠে যাবে। যাঁরা সারাদিন সিরিয়াল দেখিয়ে বাণিজ্য করছেন, তাঁরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

সুন্দরবন নিয়ে এত উদাসীনতা কেন?

সুমিত চক্রবর্তী

শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা? খুব ছোটবেলা থেকেই কবিতার লাইনটা শুনে আসছি। কে সুপর্ণা, তাও জানি না। তাঁর সঙ্গে শীতের কী সম্পর্ক, তাও জানি না। তবে, শীত আর কিছুতেই আসছে না। এমনিতেই এখন প্রায় দশ মাস গ্রীষ্মকাল। এখন তো আবার পৌষ মাসেও জৈষ্ঠ মাসের আমেজ এসে যাচ্ছে।

খুব ইচ্ছে ছিল, এবার সুন্দরবন যাব। এর আগে সরকারি লঞ্চ এম ভি চিত্ররেখা ও এম ভি সর্বজয়ায় সুন্দরবন গেছি। দুবারই বেশ ভাল অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবারও ভেবেছিলাম, দুদিন বা তিন দিনের জন্য পাড়ি দেব সুন্দরবনে।

পুজোর আগে থেকেই সার্চ করে চলেছি। এখনও সেই এম ভি সর্বজয়া বা এম ভি চিত্ররেখার হদিশ নেই। কবে চালু হবে, কিছুই জানা যাচ্ছে না। একদিন পর্যটন উন্নয়ন নিগমে ফোন করলাম। তাঁরাও কিছু জানাতে পারলেন না। গতবছরও সেই একই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতেও দেখে মেলেনি পর্যটন দপ্তরের লঞ্চের। মার্চ বা এপ্রিলে নম নম করে কয়েকটা ডেট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন শীত ফুরিয়ে গরমের চোখরাঙানি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে, ইচ্ছে থাকলেও অনেকে যেতে পারেননি।

এই বছরও এখনও সেই লঞ্চের দেখা নেই। জানুয়ারির পর আদৌ সুন্দরবন যাওয়ার মতো পরিবেশ থাকবে কিনা বলা মুশকিল। সন্দরবন ট্যুর মানে তিন মাসের ট্যুর। বাকি ন মাস সেখানে সেভাবে যাওয়া যাবে না। বেসরকারি বেশ কিছু ট্যুর অপারেটর আছেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্যাকেজ ট্যুরে নিয়ে যান। এবছরও সেইসব প্যাকেজ ট্যুর চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সরকারি পরিষেবা এখনও কেন চালু হল না, বোঝা মুশকিল।

মানছি, এখন পরিস্থিতি কিছুটা অন্য-রকম। কিন্তু অন্যান্য সব জায়গায়

পর্যটনের দরজা খুলে গেছে। এমনকী গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরেও সরকারি প্যাকেজ ট্যুরের কথা ওয়েব সাইটে দেখা যাচ্ছে। বাসে কলকাতা ভ্রমণ বা সন্ধেবেলায় বাবুঘাট থেকে লঞ্চ ভ্রমণের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ছে। তাহলে, সুন্দরবন কী দোষ করল!

বেঙ্গল টাইমসে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা পড়ি। তাই ওপেন ফোরামে পর্যটন দপ্তরের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, শীত থাকতে থাকতেই সুন্দরবন ট্যুর চালু করা হোক। এখনও সরকারি পরিষেবার ওপর মানুষ আস্থা রাখেন। এখনও বাঙালি বাংলায় ঘুরতে চায়। কিন্তু সরকার নিজেই যদি উদাসীন থাকে, তাহলে পর্যটন পিছিয়ে যায়।

ভূতের খোঁজে নৈশ অভিযান শিমূলতলায়

উঠল বাই, শিমূলতলা যাই। হঠাৎই চলে যাওয়া। তাও প্রায় আঠারো বছর আগে। সারাদিন টেনে ঘুম, রাতে হ্যাজাক নিয়ে বেরিয়ে পড়া। এমনই নৈশ অভিযানের স্মৃতি উঠে এল সৌম্যদীপ সরকারের লেখায়।

তখন হালকা শীতের আবহ। তখনও মোবাইল নামক বস্তুটি এতটা গণহারে ছড়িয়ে যায়নি। স্মার্টফোন, জিও-ডেটা এসব শব্দগুলি তখনও আম বাঙালি শোনেনি। 'অনুপ্রেরণা' নামক শব্দটি ডিকশেনারিতে থাকলেও যত্রতত্র তার ব্যবহার ছিল না। কারও কারও মোবাইল থাকলেও ফোন এলেই

ইনকামিংয়ের জন্য মিনিট পিছু তিন টাকা গচ্চা যেত।

তেমনই একটা সময়ে হঠাৎ করে শিমূলতলা অভিযান। কোনও আগাম পরিকল্পনাই ছিল না। গুগল নামক সিধু জেঠুর কাছে রুট জানার উপায়ও ছিল না। সেই উঠল বাই, শিমূলতলা যাই। আসলে, সেবার গিয়েছিলাম ডিসেরগড়ে, ছিন্নমস্তা মেলায়। সেখান থেকেই 'ভূত' নিয়ে নানা আলোচনা। তখনই একজন বলল, শিমূলতলায় ভূত দেখতে গেলে কেমন হয়! ধ্বনি ভোটে প্রস্তাব পাস। আমি তখন কলেজের ছাত্র। বয়সে সর্ব-কনিষ্ঠ। আমার আপত্তি ধোপে টিকল না। আমার অবশ্য শিমূলতলা নিয়ে আপত্তি ছিল না। বলেছিলাম, ভূত বলে বস্তুই যখন নেই, তখন তা দেখতে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। বেড়াতে যাচ্ছি বললে আপত্তি নেই, কিন্তু ভূতকে টেনে আনা কেন? সংখ্যাগরিষ্টের রায়ে আমার যুক্তি ধোপে টিকল না।

ঠিক হল, শিমূলতলাই যাওয়া হবে, এবং ভূত দেখাটাই মূল এজেন্ডা। সভা থেকে ওয়াক আউট নয়। বরং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সেই তত্ত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে শিরোধার্য করেই পাড়ি দিলাম। কোন ট্রেনে গিয়েছিলাম, কোথায় গিয়ে নেমেছিলাম, এতদিন পর আর মনে নেই। শুধু মনে আছে, ভোরেই ট্রেনে উঠেছিলাম। বোধ হয় ঘণ্টা তিনেক লেগেছিল। অনলাইন বুকিং নামক শব্দটা তখনও আমরা শুনিনি। নেমে শুনলাম, হোটেল-ফোটেল তেমন কিছু নেই। কারও বাড়িতেই থাকতে হবে। একটা ঠ্যালা ভ্যান জুটল। সে-ই একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। আসার পথেই দেখছিলাম, একের পর এক বাড়ি। বাইরে তালা ঝোলানো। দরজায় শ্যাওলা জমে। কোনও অনুপ্রেরণা ছাড়াই নিজের নিয়মে লতা পাতা গজিয়ে গেছে। কেউ থাকে বলে মনে হয় না। সাম্প্রতিককালে কেউ এসেছে বলেও মনে হয় না। তাহলে এগুলো কাদের বাড়ি? কারা বানিয়েছেন? কেনই বা বানিয়েছেন? নানা প্রশ্ন তখন উকি দিচ্ছে। কিন্তু কাকেই বা প্রশ্ন করব? কেউ তো নেই। অগত্যা, নিজেরাই প্রশ্ন করছি। নিজেরাই মনে মনে উত্তর সাজাচ্ছি। বাঙালি একসময় পশ্চিমে যেত। বাঙালির পশ্চিম বলতে এইসব জায়গাগুলোই বোঝাতো। কয়েক দিনের হাওয়া বদল। গল্পে-সিনেমায় পড়েছি, দেখেছি।

আমাদেরও ঠাঁই হল তেমনই এক বাড়িতে। কেয়ার টেকারের দেখা পেলাম। উঠোনের ভেতর কুয়ো। দড়ি, বালতি আছে। নিজেদেরই তুলে নিতে

হবে। মনে পড়ে গেল অরণ্যের দিনরাত্রির কথা। পালামৌ এর জঙ্গলে এমন কুয়োতেই তো স্নান করতে দেখা গেছে সৌমিত্র, শুভেন্দু, রবি ঘোষ, সমিত ভঞ্জদের। আমরাও না হয় সেভাবেই করব। কিন্তু খাওয়ার জায়গা কোথায়? কেয়ারটেকার একটা হোটেলের সন্ধান দিলেন। অর্ডার দিয়ে রাখলে রান্না করে রাখে। ঠিক হল, আগামী দুদিন আমরা সেখানেই অন্নগ্রহণ করে কৃতার্থ করব।

সবাই রাত ভোরে উঠেছে। ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে, এমন দুর্নাম কাউকেই দেওয়া যাবে না (এমনকি আমাকেও না)। যখন তোমার ঘুম ভাঙবে, তখন তোমার সকাল— এই ঐতিহাসিক গানটা তখনও লেখা হয়নি। কিন্তু আমাদের সকাল আমাদের মতো করেই হত। শিমূলতলায় পৌঁছেই সবার যেন একটাই ডেস্টি-নেশন — ঘুম। কোনও রকমে দুপুরে সেই হোটেলে খেয়ে আসা হল। ফিরে এসে আবার ঘুম। বিকেল হল, সন্ধে হল। উঠলেও বেরোনোর নাম নেই। বেড়াতে এসেছি। ঘরে বসেই কাটিয়ে দেব? এসব বলেও কোনও লাভ হল না। কেউ পাত্তাই দিল না। ওদের দাবি, তুই বেড়াতে এসেছিস, বেড়িয়ে আয়। আমরা এসেছি ভূত দেখতে, আমরা রাতে বেরোবো।

এ তো আজব পাবলিকদের পাল্লায় পড়া গেল। আমি তখন ভয়ঙ্করভাবে সংখ্যালঘু। ১:৫। অগত্যা, গণতন্ত্রের রায় শিরোধার্য। কুন্তলদা তখন নানারকম গল্প ফেঁদে চলেছে। কিছুটা সত্যি, কিছুটা জল মেশানো। কিন্তু

এমন নিপুন সেই বলার কায়দা, কোনটা দুধ, কোনটা জল, সেই ফারাক করা হাঁস তো দূরের কথা, স্বয়ং পরমহংসেরও অসাধ্য। সঙ্গ দিয়ে চলেছে জয়, কুণালরা। সানি বলে একজন গিয়েছিল। সে উঠতি ব্যান্ড গায়ক। তাই মাঝে মাঝেই গানের কথাও উঠে আসছিল। আমার খালি মনে হচ্ছিল, এরা বেড়াতে এসে ঘুমিয়ে আর ঘরে বসেই কাটিয়ে দেবে?

রাতে হোটেল তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কেয়ারটেকার বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে আসতে। কিন্তু তখন চলছে নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি। জোগাড় করা হল হ্যাজাক লাইট। কয়েকটা টর্চ তো সঙ্গেই ছিল। হ্যাজাক, টর্চ, লাঠি নিয়ে নৈশ অভিযান। হোটেলে খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়া। যেন ভূতেদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। তারা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাস্তা শুনশান। টেলিফোন বুথ নেই, ইলেকট্রিকের তার কাটা। শোনা গেল, এদিকে মাওবাদীদের উপদ্রব। তারাই তার-ফার কেটে গেছে। এই অবস্থায় লাঠি, হ্যাজাক হাতে আমরা ছজন রাতের বেলায় ঘুরছি। এ যেন উভয় সংকট। মাওবাদীরা ভাবতে পারে, পুলিশের লোক। আর পুলিশ বা গ্রামবাসী ভাবতে পারে, ব্যাটারা নির্ঘাত উঠতি মাওবাদী। রাতে দেশি মুরগির ঝোল খাওয়ার পর গণপিটুনি জুটতেই পারে।

লোকালয় থেকে আরও ফাঁকার দিকে। একটার পর একটা পোড়ো বাড়ি। কতকাল রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। কতকাল এইসব বাড়িতে কারও পায়ের ছাপ পড়েনি। দরজায় লতা পাতা ঝুলছে। হাওয়ার শব্দ। দেওয়ালের সঙ্গে গাছের ডাল ঘসা যাচ্ছে। রোমাঞ্চ-কর এক পরিবেশ। ওদের কাছে সেটা যেন ভূতের পদধ্বনি। একটু একটু করে এগোলাম জঙ্গলের দিকে। মনে মনে বলছিলাম, সারাদিন শুয়ে বসে কাটালাম, রাতে কিনা বেরোলাম ভূত দেখতে! দূরে রাস্তায় লোক পেরোচ্ছে। তাকেই বেমালুম ভূত বলে চালিয়ে দেওয়া। আর এটা-ওটা আওয়াজ উঠলে তো কথাই নেই। সব ভূতের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দাও। এভাবেই রাত এগারোটা পেরিয়ে গেল। সব বিদ্রোহী যেন রণক্লান্ত। চলো মন নিজ নিকেতনে। সবাই সেই বাড়িতে ফিরে এলাম।

বিকেল আর সন্ধেটা ছিল কুন্তলদার। কিন্তু রাতে সানিকে যে নিজের প্রতিভা মেলে ধরতেই হবে। শুরু হল ব্যা-ন্ডের গান। গান না বলে গানের গুঁতো

বলাই ভাল। কী কথা, কী সুর, কোনও কিছুর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিনি। তবু বলে যেতে হল, দারুণ হচ্ছে। একেবারেই অন্য ঘরানার গান। আর দ্বিগুন উৎসাহ পেয়ে সানিও বিকট চিৎকার (ওর ভাষায় গান) করেই চলেছে। অগত্যাই রাতটা গড়িয়ে গেল ভোরের দিকে। ভোর রাতে ঘুম। কখন ভাঙবে, কে জানে!

পরদিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলার দিকে। কী আর ব্রেকফাস্ট করব। এ তো লাঞ্চ টাইম। সেই হোটেল। ভাত দিয়েই ব্রেকফাস্ট। দুদিন হতে চলল। লাট্টু পাহাড়, রাজবাড়ি, ফলস কিছুই তো দেখা হল না। অগত্যা খাওয়ার পর একটা অটো রিজার্ভ করা হল। অটো –দাদাকে বলা হল, দু তিন ঘণ্টার মধ্যে যা যা ঘোরানোর ঘুরিয়ে দিতে। সে তো আপন মনে ইতিহাস বিকৃতি করে গেল। যে বাড়িটাই দেখছে, সেটাই নাকি বর্ধমান রাজার বাড়ি। রাজার কী দুর্দশা! পোড়ো বাড়িগুলোও তার নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই শিমূলতলায় নাকি দাদার কীর্তির শুটিং হয়েছে। কোন বাড়িতে? বুঝলাম, সে নিজেও জানে না। লাট্টু পাহাড়, ধারারা ফলস দেখা হল। পাথরের ওপর জল গড়িয়ে পড়ছে। এটাই নাকি ফলস। আর লাট্টু পাহাড়কে পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভাল। সন্ধের আগেই ফিরে আসা। আবার একপ্রস্থ ঘুম। রাতে সেই

হোটেল। খাওয়া সেরে হ্যাজাক-টর্চ -লাঠি সহযোগে ফের ভূত-অভিযান। যথারীতি রাত এগারোটা পর্যন্ত 'ভূতের সন্ধানে'। ফিরে এসে সানির গান-গুঁতো।

পরদিন ফেরার পালা। তার আগে হোটেলের ধার মিটিয়ে আসতে হবে। বিল শুনে মাথায় হাত। দুদিন চারবেলা ছজনের খাওয়া। তার মানে ২৪ টা মিল। কত হতে পারে? দোকানি যে দর হাঁকল, পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁগুলিও লজ্জা পেয়ে যেত। আন্দাজে বিশাল দর হেঁকে ফেলেছে। কিন্তু কোনটার জন্য কত, বলতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলছে। শুনলাম, আমাদের জন্য নাকি সাতশো টাকার চাল লেগেছে। ষোল বছর আগের কথা। তখন চালের কেজি বড়জোর দশ টাকা। তার মানে, আমরা দুদিনে সত্তর কেজি চালের ভাত খেয়েছি! ডুয়ার্সের হাতিগুলোও বোধ হয় পরিসংখ্যান শুনলে লজ্জা পেত। সে যাই হোক, বোঝা গেল, মোট বিলে একটা শূন্য বেশি পড়ে গেছে। তাই দশগুণ হয়ে গেছে। সেসব খুচরো ঝামেলা মিটিয়ে আবার কু ঝিক ঝিক।

যাওয়ার সময় যেসব প্রশ্নগুলো ঘোরাফেরা করছিল, ফেরার সময় আবছা আবছা উত্তর পেয়েছি। কাদের বাড়ি, কারা আসত, এখন কেন বাড়িগুলোর এমন জীর্ণ দশা, উত্তরগুলো কিছুটা পরিষ্কার। কিন্তু বাকি পাঁচজনের এসব নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে। তাঁদের আক্ষেপ, ভূত দেখা হল না। আমার অবশ্য 'ভূত প্রীতি' বা 'ভূত ভীতি' তখনও ছিল না। আজও নেই। কিন্তু সেই নৈশ অভিযানের একটা রোমাঞ্চ তো আছেই। যা এতদিন পরেও মনকে ছুঁয়ে যায়।

ভারত–পাক সিরিজই পারে সম্প্রীতি ফেরাতে

সোহম সেন

আটের দশকে ভারত–পাক লড়াই মানেই সেটা পাকিস্তানের দিকে হেলে থাকত। আর শারজায় খেলা হলে তো কথাই নেই। তখন লড়াইটা যেন আরও খানিকটা বেশিই একপেশে হয়ে যেত।

সময় বদলেছে। পরিস্থিতিও বদলেছে। ইমরান, আক্রা-মরাও নেই। গাভাসকার–কপিলরাও নেই। এখন পরিসংখ্যানটা ঠিক উল্টো। এখন ভারতের দিকেই পাল্লা ভারী থাকে। আর বিশ্বকাপের লড়াই হলে তো কথাই নেই। সেখানে ভারতের একচেটিয়া আধিপত্য।

তবু ভারত–পাক লড়াই মানেই যেন অন্য এক আবহ। ফাইনালের আগেই এ যেন অন্য এক ফাইনাল। তাই বিশ্বকাপের শুরুর ম্যাচটাই কার্যত ফাইনালের চেহারা পেয়েছিল। সেই ম্যাচেই কিনা এমন একপেশে ফলাফল! ওই একটা হারই যেন ভারতের ভিত নড়িয়ে দিল। স্রেফ সেই কাঁপুনিতেই পরের ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও হার। বিশ্বকাপ থেকেই

কার্যত বিদায়ের বার্তা।

আসলে, এই ম্যাচ মানেই এক রোমাঞ্চ। একইসঙ্গে একটা আশঙ্কার চোরাস্রোত। এই ম্যাচকে ঘিরে আবার অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে না তো? একশ্রেণির মানুষ আছেন, যাঁদের যত দেশপ্রেম, এই ম্যাচের সময়। পাকিস্তানকে হারাতে পারলেই যেন বিশ্বজয় হয়ে গেল। এরপর আর ট্রফি না জিতলেও চলবে। আবার উল্টোটাও আছে। ট্রফি জিতলেও এই ম্যাচটায় হারা চলবে না। পরিসংখ্যান বলছে, দুই দেশ শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল প্রায় আড়াই বছর আগে। তাও আবার দ্বিপাক্ষিক সিরিজে নয়। শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয়েছে এক দশকেরও আগে। খেলার মাঝে এমন যুদ্ধ-যুদ্ধ আবহ কারা আনতে চাইছেন? ভারত-পাক রেশারেশি তো আগেও ছিল। তাই বলে গাভাসকার-কপিলদেবরা কি পাকিস্তানে যেতেন না? নাকি ইমরান-মিয়াদাদরা ভারতে আসতেন না?

সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ভারত যেবার পাকিস্তানে গেল, সেবার পাক সফরে যাওয়ার আগে তাঁরা দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে। বাজপেয়ী কী বলেছিলেন, আজও প্রবাদ হয়ে আছে। তিনি সৌরভ-শচীনদের বলেছিলেন, 'দিল ভি জিতকে আনা।' অর্থাৎ, হৃদয়ও জিতে এসো। একজন রাষ্ট্রনায়কের কাছে এমনটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এখন পরিবেশটাই পাল্টে গেছে। জাতীয় চ্যানেলে সারাক্ষণ পাক বিরোধী জেহাদ। প্রতিদিন একটা করে যুদ্ধের আবহ তৈরি করো। যাই ঘটুক, এর সঙ্গে পাকিস্তানকে জুড়ে দাও। মনে মনে ঘৃণা ঢুকিয়ে দাও। রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় ছাড়া এমন প্রোপাগান্ডা চলতে পারে! এমনকী ম্যাচে হারের পর মহম্মদ সামির দিকে যে কদর্য আক্রমণ ধেয়ে আসে, এটাও তারই এক ফলশ্রুতি। যাঁরা ট্রোল করছেন, তাঁরা জানেন তাঁদের দিকে যত না ধিক্কার ধেয়ে আসবে, সাবাশি ধেয়ে আসবে তার থেকেও বেশি। এটাই বোধ হয় বদলে যাওয়া ভারতবর্ষ।

একা বিজেপিকে দায়ী করে লাভ নেই। ইউপিএ আমল থেকেই সিরিজ বন্ধ রাখার তোড়জোড়। মুম্বইয়ে তাজ হোটেলে উগ্রপন্থী হামলার সঙ্গে ক্রিকেটকে জুড়ে দেওয়ার প্রবণতা তখনও দেখা গেছে। এই আমলে দিন দিন সেটা বাড়ছে। সরকারি উদ্যোগে ঘৃণার বিপুল বিস্তার। মাঝখান থেকে খেলাটাই বন্ধ হয়ে গেল। আইপিএলে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের নেওয়া চলবে না। অলিখিত একটা ফতোয়া পৌঁছে গেল সব ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে। কার ঘাড়ে কটা মাথা? ওই দেশে সিরিজ খেলতে যাওয়া চলবে না। ওই দেশ থেকে এই দেশে সিরিজ খেলতে আসা যাবে না। ঘৃণার রাজনীতিকে ক্রিকেটের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

বোর্ডও অসহায়। তাকে সরকারের সুরে সুর মিলিয়েই কথা বলতে হবে। এক দশকের ওপর সিরিজ বন্ধ তো রাখলেন। এতে দুই দেশের সম্পর্কের কী উন্নতিটা হল? সেই আবহমান কাল ধরে শুনে আসছি, কাশ্মীর সমস্যা। এখনও সেই কি সেই সমস্যা কমেছে? বরং অনেক বেড়েছে। ভোট এলেই একটা করে সার্জিকাল স্ট্রাইক দেখাতে হবে। বীরত্বের ফানুস ওড়াতে হবে। নিজেদের সব অক্ষমতাকে আড়াল করতে দেশপ্রেমের হাওয়া তুলতে হবে। উত্তরপ্রদেশ ভোট আসছে। আরও একটা মোক্ষম তাস চাই। পাকিস্তান তো আছে। মাঝে মাঝে ভাবি, ভাগ্যিস একটা পাকিস্তান আছে। নইলে, এরা কী বলে ভোট চাইত? কী বলে হাওয়া গরম করত?

রাজনীতির ব্যাপার রাজনীতির লোকেরা বুঝুন। তার সঙ্গে খেলাকে না জুড়লেই নয়! নিজেরা সমস্যা মেটাতে পারছেন না। সেই ব্যর্থতার বোঝা খেলাধূলার ওপর কেন চাপাচ্ছেন? যে সম্প্রীতি আপনারা আনতে পারেননি, তা ক্রিকেটাররাই পারেন। ওঁদের খেলতে দিন। এই দমবন্ধ আবহে ওঁরা অন্তত তাজা অক্সিজেন আনতে পারবেন।

এতখানি উপেক্ষা বোধ হয় কোহলির প্রাপ্য ছিল না

উত্তম জানা

অধিনায়ক আর প্রশাসকের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থাকেই। এমনকী, এক সময়ের অধিনায়ক যদি পরবর্তীকালে প্রশাসনেকর ভূমিকায় উঠে আসেন, তাহলেও সেই বিরোধ থেকেই যায়। অধিনায়ক হিসেবে তিনি যেটা করতেন, যেটা চাইতেন, প্রশাসক হিসেবে তার উল্টোটাই করেন। একই ঘটনা সৌরভ গাঙ্গুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অধিনায়ক থাকার সময় সৌরভ চাইতেন, ক্রিকেট সংক্রান্ত সব ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করুন বোর্ডকর্তা ও নির্বাচকরা। গ্রেগ চ্যাপেলকে কোচ করে আনার পেছনে সবথেকে বেশি ভূমিকা ছিল সৌরভেরই। তিনি গ্রেগকে কোচ করতে চেয়েছিলেন বলেই বোর্ড সিলমোহর দিয়েছিল। আইপিএলের ক্ষেত্রেও তাই। সৌরভের সম্মতি ছিল বলেই বুকানন বা ডেভ হোয়াটমোরকে কোচ করে আনা হয়েছিল। কিন্তু বিরাট কোহলির ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটল না।

বিশ্বকাপের দলে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে মেন্টর করে আনার সময় কি বিরাট কোহলির মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল? নিশ্চিতভাবেই হয়নি। হয়ত আলোচনা হয়েছিল।

বিরাটের সামনে মেনে নেওয়া ছাড়া হয়ত উপায় ছিল না। হয়ত সেই গোঁসা থেকেই বিশ্বকাপের পর টি-২০-র নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা করে দিলেন। বিশ্বকাপ পরবর্তী ভারতীয় ক্রিকেটে রাহুল দ্রাবিড়কে কোচ করার ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা। এক্ষেত্রে তো কোহলির সঙ্গে ন্যূনতম আলোচনা টুকুও করা হয়নি। কোহলি নিজেই এমনটা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন।

কেউ কেউ বলতেই পারেন, রাহুলকে কোচ করা হবে, বোর্ডের তরফ থেকে তো এমন কোনও ঘোষণা হয়নি। কথাটা ভুল নয়। আবার ঠিকও নয়। কারণ, ঘোষণা না হলেও রাহুলই যে কোচ হচ্ছেন, তা বুঝতে আর কারও বাকি নেই। সারা দেশের মিডিয়া রাহুলকে প্রায় কোচ বানিয়েই দিল। বোর্ডসূত্রকে উদ্ধৃতও করল। বোর্ডের দিক থেকে তো কোনও রিজয়েন্ডার এল না। কোনও পদাধিকারী তো একবারও বললেন না যে এটা ভুয়ো খবর।

ঘটা করে কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কমিটি তৈরি হবে। একটা লোক দেখানো ইন্টারভিউ হবে। তারপর লোকদেখানো একটা সুপারিশ। এতসব নাটক এরপর মঞ্চস্থ হবে। মাঝখান থেকে অন্ধকারে রইলেন শুধু বিরাট কোহলি। সত্যিই কি একজন অধিনায়কের এই উপেক্ষা প্রাপ্য? সৌরভ গাঙ্গুলি যদি অধিনায়ক হতেন আর তাঁকে যদি এভাবে উপেক্ষা করা হত, তাহলে কি তিনি মেনে নিতেন? অথচ, এখন তিনি প্রশাসক। এখন তিনি যেটা চাইবেন, সেটাই আইন। তাই অধিনায়কের মতামতের গুরুত্ব নেই। এমনকী মতামত চাওয়াও হয় না।

রাহুল কেমন কোচ হবেন, সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু প্রক্রিয়াটা নিতান্তই লোকদেখানো। এবং পুরো প্রক্রিয়ায় যেভাবে কোহলিকে উপেক্ষা করা হল, এটাও কাম্য ছিল না।

বেঙ্গল টাইমস

দীপাবলি সংখ্যা
নভেম্বর, ২০২১

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in